প্রকাশক :
শ্রীপরিমল বিশ্বাস
৭০ মহেন্দ্রচন্দ্র গার্ডেন রোড
কলিকাতা - ৩০

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

গান্ধীজির বাণী

আমি দেশের সেবক

"আমি মহাত্মা নই, আমি দীনাতিদীন, কেবল "মহাত্মা" নামের দুঃখ ভোগের বোঝা মাথায় লইয়া বেড়াইতেছি। আমি ঋষি নই, মুনি নই, অবতার নই, নই সন্ন্যাসী। আমি গৃহী, আমি দেশের সেবক, আমি শুধু সত্য-সন্ধানী। আমি সাধু নই, রাজনীতিকও নই। সত্য যে অখিল জ্ঞানের উৎস, ইহাই আমি মাঝে মাঝে গভীরভাবে উপলব্ধি করি মাত্র।"

হিন্দুধর্ম ও অস্পৃশ্যতা

"অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে, অধিকন্তু উহা হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট একটা পচনশীল পদার্থ, একটা ভ্রান্তি ও একটা পাপ ; সুতরাং উহার মুলোৎপাটন করা প্রত্যেক হিন্দুরই ধর্ম ও পরম কর্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুরই উহাকে পাপ মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।"

আমার ধ্যানের ভারত

"আমি সেই ভারতই গড়িতে চাই, যে ভারতে দরিদ্রতম ব্যক্তিও মনে করিবে—এই তাহার দেশ, এই দেশে তাহার একটা সক্রিয় সত্তা আছে।

সেই ভারতে থাকিবে না উচ্চ-নীচ ভেদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে থাকিবে অকুণ্ঠ প্রীতি।

সেই ভারতে থাকিবে না অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, থাকিবে না মাদকতার বিষ।

নারী সেই ভারতে ভোগ করিবে পুরুষের সমান অধিকার।

সেই ভারত করিবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির সঙ্গে সহযোগিতা। আমরা অপরের শত্রু হইব না, অপরকে শোষণ করিব না, অপরকে আমাদের উপর শোষণ চালাইতে দিব না। এই আমার ধ্যানের ভারত।"

মহাত্মা গান্ধী

॥ বাল্য ও কৈশোর ॥

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কাথিয়াবাড় রাজ্যের পোর-বন্দর বা সুদামাপুরীতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতা কাবা গান্ধী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, সত্যপ্রিয় ও সাহসী পুরুষ। তাঁহার স্কুল ও কলেজের বিদ্যা খুব বেশী না থাকিলেও ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। অগাধ জ্ঞান ও উদার মনোভাবের জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জননী পুতুলী বাঈ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা।

পূজা, ব্রত ও উপবাস ছিল তাঁহার অভ্যাসগত দৈনন্দিন অনুষ্ঠান। ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া উপবাস করা তাঁহার কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার বলিয়াই মনে হইত।

মোহনদাসের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাঁহার পিতা কাবা গান্ধী প্রধান বিচারকের পদলাভ করিয়া রাজকোটে যান এবং মোহনদাসকে তথায় এক পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেন।

মোহনদাস কখনও শিক্ষককে ফাঁকি দিতেন না। শিক্ষকগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে তাঁহাকে প্রায় সব সময়ই

পাঠ্য-পুস্তক পাঠ করিতে হইত। কাজেই তিনি অন্য পুস্তক পড়িবার মত সময় একেবারেই পাইতেন না।

তবুও একদিন 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামক একখানি নাটক পড়িয়া তাঁহার খুব ভাল লাগিল এবং মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। একদিন ভ্রাম্যমান বায়স্কোপে তাঁহার ঐ ছবিখানি দেখিবার সুযোগও জুটিল।

শ্রবণের মত পিতৃভক্ত হইবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময় হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয়ও তাঁহাকে মুগ্ধ করিল।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব ত্যাগ ও সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ সে-দিন-ই হয় ত তাঁহার অনাগত জীবনের পথরেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল।

শ্রবণ ও হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি হউন বা না হউন, তাঁহারা মোহনদাসের অন্তরে জীবন্ত সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

পিতার সততা, সৎসাহস ও সত্যপ্রিয়তা এবং মাতার ধর্মে ভক্তি ও কঠোর উপবাস-ব্রত প্রভৃতির সমন্বয়ে মোহনদাসের দেহ ও মন গঠিত হইয়াছিল।

তের বৎসর বয়সে কস্তুরবার সঙ্গে মোহনদাসের বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই তিনি হাই-স্কুলে প্রবেশ করেন। পড়াশুনায় ও ব্যবহারে তিনি হাই-স্কুলের শিক্ষকগণের প্রশংসা অর্জন করিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে যথাক্রমে চা'র টাকা ও দশ টাকা ছাত্র-বৃত্তি লাভ করেন।

॥ স্বদেশের পথে ॥

রোগমুক্তির পর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া গন্ধীজি বিলাত হইতে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে গোখেলও ফ্রান্স হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

গান্ধীজির সম্বর্ধনার জন্য তিনি বোম্বাইয়ে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করিলেন। এই সভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ ইংরাজী ভাষায় গান্ধীজিকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইলেন।

ইহাতে গান্ধীজি দুঃখিত ও মর্মাহত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"গুজরাটবাসীর সম্বর্ধনায় গুজরাটবাসীদের সভায় ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতাদান অত্যন্ত অশোভন।"

এই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে শান্তি-নিকেতনে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন।

গান্ধীজি সদলবলে শান্তিনিকেতনে পদার্পণ করিলেন। দুই মহামানবের মহামিলনে শান্তিনিকেতন-তীর্থ সেইদিন হইতে মহাতীর্থে পরিণত হইল।

গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে গুরুত্বে বরণ করিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজিকে 'মহাত্মা' বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

তাঁহার বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। ফলে গান্ধীজির সঙ্গে বিলাতে তাঁহার দেখা হইল না।

প্রথম বিশ্বসমরের গোড়ার দিকে গান্ধীজি বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। যুদ্ধে বৃটিশকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই ছিল এই আবেদনপত্রের বিষয়-বস্তু। কিন্তু বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের তরফ হইতে এই আবেদনের উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

গান্ধীজির যুক্তির সমর্থক হিসাবে মাত্র কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লেখাইয়া চলিয়া গেল।

এই সময়ে গান্ধীজি হঠাৎ প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। স্বাস্থ্যলাভের জন্য চিকিৎসকগণ তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে দুধ ও মাংস খাইতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু গান্ধীজি কিছুতেই দুধ ও মাংস খাইতে রাজী হইলেন না।

পথ্যাদি বিষয়ে তাঁহার এই একগুঁয়েমির জন্য পরে গোখেলও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র দিয়াছিলেন।

লেখাপড়ার উন্নতি অপেক্ষা নিজের আচরণের দিকেই তিনি বেশী নজর দিতেন। তাঁহার বরাবরই লক্ষ্য ছিল যে, এমন কোন আচরণ যেন তাঁহাকে করিতে না হয়, যাহার জন্য শিক্ষকমহলে তাঁহার বদ্‌নাম হয়।

হাই-স্কুলে ভর্তি হইবার কয়েকমাস পরেই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল; ঘটনাটি উল্লেখ করার যোগ্য।

শিক্ষা-বিভাগের ইন্সপেক্টর সাহেব স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রগণকে কয়েকটি ইংরাজী শব্দের বানান লিখিতে দিলেন। এই শব্দগুলির মধ্যে মোহনদাস একটি শব্দের বানান ভুল লিখিলেন। অন্যান্য ছাত্রেরা পাঁচটি শব্দই ঠিক ঠিক বানান করিল।

মোহনলাল একাই কেবল বোকা বনিয়া গেলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য ছেলের লেখা দেখিয়া শব্দটি শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিতেন। তাঁহার শিক্ষকমহাশয়ও সেইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু মোহনদাস নকল করিলেন না। কারণ, তিনি অপর ছেলের নিকট হইতে নকল করিয়া লিখিতে কখনও শিখেন নাই। এইরূপ নকল করাকে তিনি অপরাধ বলিয়া ঘৃণা করিতেন।

মোহনদাসের এক বন্ধু তাঁহাকে প্রায়ই মদ ও মাংস খাইতে প্ররোচনা দিত এবং মদ ও মাংসের অনুকূলে বহু যুক্তি দেখাইত। বন্ধুটির উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি লুকাইয়া মাংস খাইতে আরম্ভ করিলেন।

বন্ধুটির যুক্তি ছিল এই যে, ইংরাজেরা মদ ও মাংস খায় বলিয়াই তাহারা সাহসী ও শক্তিমান্। সে বন্ধুকে এ-কথাও বুঝাইল যে, মদ ও মাংসের জোরেই মোহনদাসের চেয়ে সে অধিকতর সবল ও সাহসী।

লুকাইয়া মাংস খাইয়া যেদিন তিনি বাড়ীতে গিয়া আহারে বসিতেন, সেদিন তাঁহাকে কোন না কোন মিথ্যা কথা বলিতে হইত। কিন্তু তিনি এই ভাবিয়া মনে অস্বস্তি বোধ করিতেন যে, মিথ্যা বলিয়া বাবা ও মাকে ফাঁকি দিয়া মাংসাহারে যদি শক্তি বাড়েই, তবে বলবান্ হইবার সার্থকতা কোথায়?

তিনি বিবেকের দংশনে অস্থির হইয়া মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। তারপর আর কোনদিনই তিনি মদ বা মাংস স্পর্শও করেন নাই।

এই সময় মোহনদাস আরও একটি অন্যায় কার্যে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে অন্যায় কার্যটি হইল—সিগারেট খাওয়া। তাঁহার কাকা যে-সব সিগারেট খাইয়া ফেলিয়া দিতেন, প্রথম প্রথম মোহনদাস তাহাই কুড়াইয়া ধূমপানে তৃপ্তিলাভ করিতেন।

এই ধূমপানের মজা উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি বাড়ীর চাকরদের পয়সা চুরি করিতে শিখিলেন। অবশ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার মনে এই জন্য খুবই ধিকার আসিল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সিগারেট খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন।

জীবনে আরও একবার তিনি অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। একসময়ে কোনও দোকানে পঁচিশ টাকা দেনা হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার দাদার সোনার বালার

খানিকটা অংশ কাটিয়া উহা বিক্রি করিয়া ঋণশোধ করেন।

পর পর এই তিনটি ব্যাপারে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন। তিনি রোগশয্যায় শায়িত পিতাকে তাঁহার অপরাধের কথা জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পিতা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

পিতার এই ক্ষমার আদর্শ হইতেই হয়তো তাঁহার চিত্তে অহিংসার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

বাল্যকালে মোহনদাসের মনে ভূতের ভয় ছিল প্রবল। বাড়ীর পরিচারিকা ভূতের ভয় এড়াইবার জন্য তাঁহাকে 'রামনাম' শিক্ষা দেন। এই সরল-হৃদয়া নারীর কাছেই মোহনদাসের 'রাম-নামের' হাতে-খড়ি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে মোহনদাস তাঁহার স্নেহময় পিতাকে হারাইলেন। তিনি রোগশয্যায় পিতাকে দিবারাত্র অক্লান্তভাবে সেবা করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবনগরে শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হইলেন। কলেজের পাঠ তাঁহার কাছে খুবই কঠিন বলিয়া মনে হইল।

তিনি বলিতেন,—"বিদেশী ভাষায় লেখাপড়া শিক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার।" তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, ভারতীয়দের সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইংরাজী—এই চারিটি ভাষা শিক্ষা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

॥ বিলাতের আবহাওয়ায় ॥

ভবনগর কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পর গান্ধী-পরিবারের পরম হিতৈষী মাধবজী দুবে মোহনদাসকে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাইবার জন্য পরামর্শ দেন।

সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এবং সর্বোপরি তাঁহার মাতা ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন।

মোহনদাস মাতাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তিনি মনে করিতেন, বিলাতে গেলে যুবকেরা মদ-মাংস খায়, বিলাতের মেয়েরা যুবকদের মন বিগ্‌ড়াইয়া দেয়।

অবশেষে মোহনদাস মায়ের নিকট শপথ করিলেন যে, বিলাতে যাইয়া তিনি মদ-মাংস প্রভৃতি স্পর্শও করিবেন না। অগত্যা তিনি পুত্রকে বিলাত যাইবার অনুমতি দিলেন।

মোহনদাস ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যান এবং ডাঃ প্রাণজীবন মেটার সাহায্যে এক প্রাইভেট 'লজিং-হাউসে' বাস করিতে থাকেন।

প্রথম প্রথম তাঁহার বিলাত মোটেই ভাল লাগিত না। তাঁহার কেবলই মনে পড়িত—স্নেহময়ী জননীর কথা,—আর দেশের কথা।

বিলাতের আহার ও আদব-কায়দায় তিনি অভ্যস্ত হইতে পারিলেন না। মাংসহীন খাদ্য চিনিয়া লইতে তাঁহার খুবই অসুবিধা হইতে লাগিল। বিলাতী কোন খাবার তাঁহার

ভাল লাগিত না। তিনি যাহা খাইতে চাহিতেন, তাহা পাইতেন না, যাহা পাইতেন, তাহা তিনি খাইতে পারিতেন না। তদুপরি বিলাতী আদব-কায়দা আয়ত্ত করিতে না পারায় তিনি মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেন। সব সময়েই তিনি মনে করিতেন,—এই কাজটি বুঝি শিষ্টাচার বহির্ভূত হইল।

খাদ্য ও পোষাক প্রভৃতির দিকে নজর দিতে তাঁহার বহু টাকা ব্যয় হইত। চুল আঁচড়াইতে ও টাই বাঁধিতে তাঁহার অনেকখানি সময় নষ্ট হইত। তিনি বিলাতে নৃত্য ও ভায়োলিন (বেহালা) শিখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিখিতে পারিলেন না।

অবশেষে একদিন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, এত পয়সা খরচ করিয়া যাহা শিক্ষা করিব, তাহা দ্বারা আমার কি উপকার হইবে? ভারতবর্ষে ইহার প্রয়োজন ও সার্থকতাই-বা কোথায়?

ক্রমে ক্রমে তিনি সব ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। আগে ছিল দুইখানি ঘর; তাহার মধ্যে একখানি রাখিলেন এবং আহারে-বিহারে পুরামাত্রায় ব্যয়-সঙ্কোচ করিলেন। সেই দিন হইতেই তিনি দৈনিক খরচের হিসাব রাখিতে লাগিলেন এবং অর্থাদি ব্যয়-ব্যাপারে নিজেকে আয়ত্তে আনিলেন।

সেই দিন হইতেই তিনি আজীবন রীতিমত হিসাব রাখার নিয়ম পালন করিতে শিক্ষা করেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন মোহনদাস ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১১ই জুন হাইকোর্টে নাম রেজেষ্ট্রী করিলেন। ইহার পরদিনই তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন।

বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াই তিনি তাঁহার স্নেহময়ী মাতার মৃত্যু

সংবাদ পাইলেন। তাঁহার মাতা যখন মারা যান, তখন তিনি বিলাতে ছিলেন। কিন্তু পড়াশুনায় ব্যাঘাত হইবার ভয়ে তাঁহার দাদা তাঁহাকে এই সংবাদ জানান নাই।

মায়ের মৃত্যু সংবাদে তিনি একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। দারুণ শোকে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল; তবু তিনি এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিলেন না।

॥ দক্ষিণ আফ্রিকায় ॥

বন্ধুদের পরামর্শে গান্ধীজি ব্যারিষ্টারী করিতে বোম্বাইয়ে গেলেন। কিন্তু প্রথম দিন কোর্টে গিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যারিষ্টারী করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি মোটেই পসার জমাইতে পারিলেন না। তাঁহার আয় নাই, অথচ খরচ ছিল প্রচুর পরিমাণে।

বোম্বাইয়ে আইন ব্যবসায়ে হতাশ হইয়া তিনি রাজকোটে ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে তিনি একটি অফিসও খুলিলেন। ভ্রাতার এক উকিল বন্ধুর সহায়তায় তিনি গরীব মক্কেলদের কিছু কিছু আর্জি করিবার ভার পাইলেন। তাহাতে মাসিক প্রায় তিন শত টাকা আয় হইতে লাগিল।

এই সময়ে পোরবন্দরের এক ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী গান্ধীজিকে কোন একটি মামলা লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইতে চাহিলেন।

ভ্রাতার পরামর্শে গান্ধীজি এই প্রস্তাবে রাজী হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ডারবানের আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ গান্ধীজিকে তাঁহার পাগড়ী খুলিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। গান্ধীজি পাগড়ী খুলিলেন না, 'লজিং-হাউসে' ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর পাগড়ীর সমর্থনে তিনি খবরের কাগজে লেখা পাঠাইতে লাগিলেন, কাগজে খুবই তোলপাড় হইল।

ইহাতে দু'চার দিনের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র গান্ধীজির নাম প্রচার হইয়া পড়িল।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহার প্রথম বিদ্রোহ ও প্রথম সংগ্রাম।

গান্ধীজি মোকদ্দমার কাজে ডারবান হইতে প্রিটোরিয়ায় যাত্রা করিলেন। পথে মরিৎস্‌বার্গে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে জোর করিয়া নামাইয়া দেওয়া হইল।

গান্ধীজির একমাত্র অপরাধ—তিনি ভারতবাসী।

স্টেশনের মুসাফিরখানায় দুরন্ত শীতের রাত্রি তিনি অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলেন। তিনি বুঝিলেন—ইহা হইল বর্ণ-বিদ্বেষের ফল,—সাদা ও কালা চামড়ার ঝগড়া।

তিনি দেখিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র ইংরাজেরা প্রবাসী ভারতীয়দের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইতেছে,—জাতিতে জাতিতে পর্বত প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় ইংরাজেরা ভারতীয়দের ভোটাধিকার হরণ করিল। এমন কি, পাথরের ফুটপাথে চলিবার কোন অধিকারও ভারতীয়দের রহিল না।

অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য গান্ধীজি একটি 'ভারতীয় সমিতি' গঠন করিলেন। প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে স্মারকলিপি পাঠাইলেন।

ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার খুব পসার ও খ্যাতি হইল না সত্য; কিন্তু দেশজোড়া নাম হইল অসাধারণ বিপ্লবী ও কর্মী হিসাবে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে দাদা আবদুল্লার গৃহ-প্রাঙ্গনে

গান্ধীজির নেতৃত্বে 'নাটাল কংগ্রেসের' প্রথম অধিবেশন হয়। সে-দিন হইতেই সুরু হইল ভারতীয়দের অধিকার ও আত্মসম্মান রক্ষার আন্দোলন।

গান্ধীজি ভারতীয় শ্রমিকদের উপর ইউরোপীয়দের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলেন। তিনি স্যার ফিরোজশা মেটা, লোকমান্য তিলক ও মহামতি গোখেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন।

ইংরাজেরা তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী প্রচারকার্য চালাইবার জন্য গান্ধীজিকে আর ডারবানে আসিতে দিতে চাহিল না। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল।

গান্ধীজি যখন পুনরায় জাহাজে ডারবানে পৌঁছিলেন, তখন সমস্ত যাত্রীকেই জাহাজের মধ্যে আটক থাকিতে হইল।

পাঁচদিন পর্যন্ত কোন যাত্রীই বন্দরে নামিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া গান্ধীজি ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গ বন্ধু অবশেষে বন্দরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু পথে তাঁহাকে অকথ্য অত্যাচার ও আক্রমণ সহ্য করিতে হইল।

এমন কি, অত্যাচারে তাঁহার প্রাণহানির উপক্রমও ঘটিল। নিরুপায় হইয়া তিনি থানাতে ছদ্মবেশে আশ্রয় লইলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গান্ধীজি সর্বপ্রথমে যোগদান করিলেন 'জাতীয় কংগ্রেসে'র অধিবেশনে।

আবার তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকায় গেলেন এবং

উপনিবেশ সচিব চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করিলেন। গান্ধীজি তাঁহাকে ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগের কথা জানাইলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজি 'ইণ্ডিয়া ওপিনিয়ন' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। সেই পত্রিকায় তিনি ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার কথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

'ইণ্ডিয়া ওপিনিয়নে' ইংরাজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চলিতে লাগিল।

ট্রান্সভালে অবস্থানকালে ডারবান হইতে তের মাইল দূরে তিনি 'ভারতীয়দের জন্য ফিনিক্স-সেটেলমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই কার্যে তিনি মিঃ আলবার্ট ওয়েস্ট ও শ্রীরুস্তমজীর আন্তরিক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

জোহান্সবার্গে সহকর্মীদের সঙ্গে গান্ধীজি গম পিষিতেন, ক্ষৌরকর্ম, কাপড় পরিষ্কার ইত্যাদি কার্যও করিতেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভাল সরকার আইনজারী করিয়া ভারতীয়দের আফ্রিকা-অবস্থান নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিল। থানায় হাজিরা দেওয়ার এবং আঙ্গুলের ছাপ রাখিবার জন্য ভারতীয়দের উপর আদেশ জারি হইল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজির নেতৃত্বে ও নির্দেশে ভারতীয়গণ জোহান্সবার্গের 'ওল্ড এম্পায়ারে' সমবেত হইলেন। তাঁহারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।

স্থির হইল—আইন অমান্য করিতে হইবে। গান্ধীজির প্রদর্শিত 'সত্যাগ্রহ' ব্রহ্মাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই কালা-কানুন

রদের জন্য গান্ধীজি জেনারেল স্মাটের নিকট চরম পত্র দিলেন।

কিন্তু ফল দাঁড়াইল বিপরীত। জেনারেল স্মার্ট ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন।

ভারতীয়েরা দলে দলে আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করিতে লাগিল। জেলখানা ভরিয়া গেল।

পৃথিবী অবাক্ বিস্ময়ে তাকাইল এই নূতন অস্ত্র, ইহার প্রয়োগ কৌশল এবং ইহার প্রযোজকের দিকে।

এই অনাচার ও অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে গান্ধীজি বিলাতের মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

এইজন্য তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গেলেন এবং আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না।

অগত্যা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজি বাধ্য হইয়া 'সত্যাগ্রহ' চালাইলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই আন্দোলন পরিচালনা করিলেন। এই জন্য তিনি বহুবার কারাযন্ত্রণা, দৈহিক পীড়ন ও অকথ্য লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন।

গান্ধীজির নির্দেশ পালনে আফ্রিকার প্রতিটি নরনারী সেদিন বিরাট আগ্রহ ও গভীর শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিল। তাঁহার নির্ভুল নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর আন্দোলন জয়লাভ করিল। তিনি এক বিরাট মহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের সম্মান ও আসন লাভ করিলেন।

সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে অনেক নূতন নূতন নিয়ম-কানুন তাঁহাকে প্রবর্তন

করিতে হইয়াছিল। গান্ধীজি প্রয়োজনবোধে তখন যে নিয়ম-কানুন প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তিনি নিজে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের পরে স্বদেশে ফিরিবার সময় গান্ধীজিকে ভারতীয়েরা বহু মূল্যবান উপহার দিয়াছিল। তিনি সে সমস্ত মূল্যবান উপহার ভারতীয়দের প্রয়োজন ও মঙ্গলের জন্য দান করেন।

প্রথমে কস্তুরবা ইহাতে আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজির মনোভাব বুঝিয়া পরে তিনি স্বামীর প্রস্তাবই সমর্থন করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই গান্ধীজি বিলাত-যাত্রা করিলেন। প্রথম বিশ্বসমরের রণ-দামামায় তখন ইউরোপের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতের অন্যতম জননায়ক মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখেল তখন বিলাতে বাস করিতেছিলেন। তিনি গান্ধীজিকে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে দেশে ফিরিবার পথে বিলাতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

গান্ধীজি যথাসময়ে বিলাতে পৌঁছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে গোখেলের সহিত তাঁহার দেখা হইল না।

গোখেল তখন ভগ্ন-স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ফ্রান্সের প্যারি শহরে বাস করিতেছিলেন।

গান্ধীজির পত্র পাইয়া তিনি বিলাতে আসিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ছাড়পত্র পাইতে

॥ ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ ॥

ভারতে ফিরিয়াই গান্ধীজি ভারতীয় শ্রমিকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কান পাতিয়া শুনিলেন তাহাদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-বেদনার কথা।

তাঁহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল বিদেশী মালিকদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ভারতের লক্ষ লক্ষ শোষিত ও বুভুক্ষু শ্রমিক আসিয়া গান্ধীজিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

গান্ধীজি শ্রমিকদের ডাক দিয়া বলিলেন,—"তোমাদের বুকের রক্তের বিনিময়ে যে অর্থ অর্জিত হইতেছে, সে অর্থের উপর তোমাদেরও একটা প্রকাণ্ড দাবী রহিয়াছে। সংগ্রাম করিয়া সেই দাবী আদায় করিতে হইবে। তোমরা সকলে সংঘবদ্ধ হও, এই সংগ্রামে আমিই তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিব।"

গান্ধীজির ডাকে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইতে লাগিল। মরা-গাঙে জীবনের বান দুকূল ছাপাইয়া বহিয়া গেল।

বিহারের চম্পারণে তখন নীলকর শ্রমিকদের উপর বিদেশী মালিকদের ঘোর অত্যাচার চলিতেছিল।

গান্ধীজি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন উৎপীড়িত শ্রমিকদের পাশে, সুরু হইল শোষক ও শোষিতের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম।

এই সংগ্রামে গান্ধীজি অপূর্ব সাফল্য অর্জন করিলেন।

বিদেশী মালিকেরা নতি স্বীকার করিল গান্ধীজির কাছে।

নির্যাতিত শ্রমিকেরা গান্ধীজির গলায় পরাইয়া দিল বিজয়মাল্য। ভারতের বুকে ইহাই হইল গান্ধীজির প্রথম সত্যাগ্রহ সংগ্রাম।

চম্পারণ সত্যাগ্রহের বিজয়বার্তা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। যুগ-যুগান্তের উৎপীড়িত শ্রমিকেরা সাহারার বুকে এতদিনে 'ওয়েসিসের' সন্ধান পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ইহার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর গান্ধীজি ভারতীয় জনগণের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন।

যেখানে দুঃখ-বেদনা, যেখানে অনাচার-অত্যাচার, যেখানে অবমাননা-লাঞ্ছনা, যেখানে অসুন্দর-অসত্য, সেখান হইতেই গান্ধীজির ডাক আসিতে লাগিল। সেখানেই তিনি বরাভয় মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

ভারতের সমাজ, ভারতের ধর্ম, ভারতের রাজনীতি, ভারতের অর্থনীতি—সব কিছুই গান্ধীজির ছোঁয়াচ লাগিয়া সঞ্জীবিত ও বলিষ্ঠ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

দীর্ঘ দুই শত বৎসরের ঘুম-ঘোর কাটাইয়া নিদ্রিত সিংহ গর্জিয়া উঠিল,—"সময় এসেছে এবার, শিকল ছিঁড়িতে হবে।"

এইবার গান্ধীজি আসিয়া দাঁড়াইলেন ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে।

দুইশত বৎসরের ইংরাজ-শোষিত ভারতের এক

কঙ্কালসার ভয়ঙ্করী মূর্তি ছায়াচিত্রের মত তাঁহার মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

ইংরাজের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা এক মুহূর্তেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইংরাজের শয়তানি শাসনের কবল হইতে কোটী কোটী ভারতবাসীকে কি করিয়া রক্ষা করা যায়, সে-দিন হইতে এই চিন্তাই হইল গান্ধীজির দিবসের ধ্যান এবং রাত্রির স্বপ্ন।

ইউরোপের সর্বত্র তখন যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

যুদ্ধের আগুন ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই আগুনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া গান্ধীজি চিন্তা করিলেন,—ভারতের এখন কি করা উচিত।

এমন সময় ভারতের ইংরাজ বড়লাট গান্ধীজিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর বড়লাট আশ্বাস দিলেন,—"ভারতবর্ষ যদি এই যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করে, তবে যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।"

গান্ধাজি ইংরাজের সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তিনি সদলবলে যুদ্ধজয়ে ইংরাজকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন।

এতদিন মুখে অহিংসার কথা বলিয়া গান্ধীজি যখন ইংরাজের জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে কপট অহিংস-সন্ন্যাসী বলিয়া গালি দিতে লাগিল।

গান্ধীজি বিরুদ্ধবাদীদিগকে বুঝাইলেন,—"দেখ, পরাধীন ভারতবাসীর একখানা ছোরা পর্যন্ত হাতে তুলিবার অধিকার নাই। কিন্তু যুদ্ধে সাহায্য করিবার নাম করিয়া যদি

ভারতবাসী অস্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র শিক্ষা করিতে পারে, যদি তাহারা সাহসী হইয়া মৃত্যুভয় দূর করিতে পারে, তখনই তাহারা বীরের মত বাঁচিতে পারিবে। যে জাতি মৃত্যুকে যত বেশী ভয় করে, সে জাতি তত বেশী মরে। এই অলীক মৃত্যুভয়ই ত ভারতবাসীকে মরণোন্মুখ ও পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। যে জাতি বীরের মত মরিতে জানে, সে-জাতি কখনও পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয় না।"

"ভালুকের থাবার নীচে পড়িয়া শেয়াল যদি বলে, 'আমি ভালুককে ক্ষমা করিলাম, আমি অহিংসার পূজারী'। তখন তাহার ক্ষমার কোন মূল্য আছে কি? আর ভালুক যদি বাঘের উপর তাহার থাবা পরীক্ষা করে এবং বাঘ যদি বলে, 'আমি ভালুককে ক্ষমা করিলাম'; তবে সেই ক্ষমারই একটা মূল্য আছে,—সেই ক্ষমাই সত্যকারের ক্ষমা এবং সেই ক্ষমাই আমার কাম্য।

ক্ষমা দুর্বলের জন্য নয়; যিনি প্রকৃত বীর, তিনিই ক্ষমার অধিকারী।

যুদ্ধে যোগ দিয়া যদি আমরা সাহস অর্জন করিয়া মৃত্যুভয় দূর করিতে পারি, তবেই হয় ত' বা একদিন ইংরাজ আমাদের উপর হইতে তাহাদের থাবা গুটাইয়া লইতে বাধ্য হইবে।"

গান্ধীজি ভারতের জনবল ও ধনবল দিয়া ইংরাজকে যথা-সাধ্য সাহায্য করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল। কিন্তু ইংরাজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না।

গান্ধীজি মর্মাহত হইলেন। ইংরাজের মত একটা সুসভ্য

জাতি কি করিয়া অত বড় একটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিল, চিন্তা করিয়া তিনি লজ্জায়, ঘৃণায় ও অপমানে হতবাক্ হইলেন। এতদিন পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে ভারতের জাতীয় সম্পদ্ নিয়োজিত করিয়া ভারতের প্রতি তিনি চরম অবিচার করিয়াছেন।

ভারতবাসীকে, তথা বিশ্ববাসীকে গান্ধীজি ডাক দিয়া জানাইয়া দিলেন,—"ইংরাজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে,—শাসনের নামে শোষণ চালাইতেছে, সুতরাং ভারতবর্ষ শাসনের আর কোন নৈতিক অধিকারই তাহাদের নাই।"

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াই ইংরাজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার জন্যও তাহারা প্রস্তুত হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে 'রাউলাট আইন' পাশ হইয়া গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনকে গলা টিপিয়া মারাই হইল এই আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

জাতির অপমানজনক 'রাউলাট আইনের' প্রতিবাদে গান্ধীজি হরতাল ঘোষণা করিলেন।

গান্ধীজির আদেশে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের সর্বত্র এই হরতাল পালিত হইল। ইংরাজ সরকার গান্ধীজিকে বন্দী করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

ইংরাজ প্রমাদ গণিল। আগুন নিভাইবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। গান্ধীজিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইল, কিন্তু আগুন নিভিল না। শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রামে এবং পল্লীর পর পল্লীতে এই আগুন প্রলয়াগ্নিরূপে ছড়াইয়া পড়িল।

॥ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ॥

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ান-ওয়ালাবাগে একটি বিরাট প্রতিবাদ সভার আয়োজন হইল।

সভা চলিতেছিল, এমন সময় পাঞ্জাবের ইংরাজ-বর্তারা সেই জনসভায় ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং নিরীহ ও নিরস্ত্র জনতার উপরে নির্বিচারে গুলি চালাইল।

যাতায়াতের একটিমাত্র পথ, আর সেই পথ আটক করিয়া দাঁড়াইল নর-পশু মাইকেল ও'ডায়ারের সৈন্যদল।

নারী-পুরুষ, যুবক-শিশু-বৃদ্ধ দলে দলে গুলির আগুনে প্রাণ দিল। সন্ধ্যার আকাশ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

পাঞ্জাব পঞ্চ-নদীর দেশ। সেখানে আর একটি রক্তের নদী বহিয়া গেল।

ক্ষমা ও প্রেমের অবতার যিশুখৃষ্টের শিষ্যগণের এ-হেন ঘৃণ্য কার্য দেখিয়া বনের হিংস্র পশুরাও বোধ করি, সেদিন লজ্জায় মুখ লুকাইল।

ভারতের ইতিহাসে সে-দিন রক্তাক্ষরে লিখিত হইল জালিয়ানওয়ালাবাগের নাম; আর এই একটিমাত্র নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিল ইংরাজ-শাসিত ভারতে পৌণে দুইশত বৎসরের রক্তাক্ত ইতিহাস।

এই অশ্রুতপূর্ব নরমেধ যজ্ঞের কাহিনী যথাসময়ে গান্ধীজির কানে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহার শরীরের সমস্ত রক্তটুকু এবই মুহূর্তে মস্তকে উঠিয়া আসিল।

তিনি পাঞ্জাবে যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু ইংরাজ-কর্তারা নানা অছিলায় তাঁহার পাঞ্জাব-যাত্রা বিলম্বিত করিতে লাগিল।

তাহারা গান্ধীজিকে বলিল,—"এখনও আপনার পাঞ্জাবে যাইবার সময় হয় নাই। সময় হইলেই আমরা আপনাকে তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।"

ইহার উত্তরে গান্ধীজি তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন,—"রাজনীতি করিবার জন্য নয়,—আর্তের সেবা করিবার জন্যই আমি পাঞ্জাবে যাইতেছি। সুতরাং এখনই আমাকে পাঞ্জাব যাত্রার অনুমতি দিতে হইবে। অন্যথায় আমি তোমাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই পাঞ্জাব-যাত্রা করিব।"

ইংরাজ-কর্তারা ভালভাবেই জানিতেন যে গান্ধীজি ভাঙেন, তবু মচ্‌কান না। কাজেই তাহারা বেগতিক দেখিয়া গান্ধীজিকে পাঞ্জাব-যাত্রার অনুমতি দিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ছয়মাস পরে, অর্থাৎ অক্টোবর মাসে গান্ধীজি পাঞ্জাবে পৌঁছিলেন। তখনও পাঞ্জাবের গায়ের ক্ষত শুকায় নাই, রক্তের দাগ মুছিয়া যায় নাই।

গান্ধীজি আসিয়া দাঁড়াইলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ-শ্মশানের বুকে। তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, পায়ের তলার মাটি সর্ সর্ করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। গান্ধীজি তাঁহার বিবেককে প্রশ্ন করিলেন,—"ন্যায়ের দণ্ড হাতে লইয়া যাহারা এইরূপ কসাই-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, এই দেশ শাসন করিবার কোন নৈতিক অধিকার তাহাদের আছে কি?"

তিনি বিবেকের কাছ হইতে উত্তর পাইলেন—'না'; আকাশে-বাতাসে সর্বত্রই প্রতিধ্বনি হইল—'না' 'না' 'না'।

গান্ধীজি বুঝিতে পারিলেন না যে, মানুষ কি করিয়া এতদূর নীচে হিংস্র-পশুর স্তরে নামিতে পারে! কি করিয়া মানুষ এরূপ ঘৃণ্য নরহত্যায় লিপ্ত হইতে পারে? লজ্জায় ও ঘৃণায় তিনি মরিয়া গেলেন, ভাবিলেন,—"দোষ ত আমাদেরই।"

যাহারা অন্যায় করে এবং যাহারা সেই অন্যায় মুখ বুজিয়া সহ্য করে, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? উভয়েই সমান অপরাধী এবং উভয়েই সমান দণ্ডার্হ।

বীর প্রসবিনী পাঞ্জাবের বুকে পাঞ্জাবের সন্তানেরা বুকে হাঁটিয়াছে, প্লেগের ইঁদুরের মত খাঁচার ভিতরে থাকিয়া পচিয়া মরিয়াছে।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—এই পৃথিবীতে নির্বীর্যের কোন স্থান নাই, তাহাদের বাঁচিবারও কোন অধিকার নাই।"

এই পাঞ্জাবেরই ছেলে বীর পুরুরাজ একদিন বুকের রক্ত ঢালিয়া ভারতের মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই পাঞ্জাবের আজ এই দশা! আজ পাঞ্জাব তাহার বীরত্ব হারাইয়াছে, সাহস হারাইয়াছে, তাই তাহার এই দশা!

সিংহ-শিশু হইয়া যাহারা গর্দভের চামড়া ঢাকা দিয়া বাঁচিতে চায়, বুকে হাঁটাই তাহাদের উচিত, বুকে হাঁটাই তাহাদের বিধি-নির্দিষ্ট শাস্তি।

গান্ধীজি ভারতবাসীকে ডাক দিলেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—ওঠ, জাগো, আর ঘুমাইও না। তোমরাও মানুষ, তোমরাও এই পৃথিবীর দাবীদার, তোমাদেরও এই পৃথিবী ভোগ করিবার অধিকার রহিয়াছে।

ভারতের মরা গাঙে আবার বান ডাকিল। আসমুদ্র হিমাচল পৌঁছাইল গান্ধীজির সে ডাক।

দুইশত বৎসরের ঘুম-ঘোর কাটাইয়া ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠিল ;—মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল সে ইংরাজের মুখোমুখী।

ভারতবর্ষ জাগিল। সংগ্রাম আরম্ভ হইল শাসক ও শাসিতে।

সংগ্রামের সেনাপতি হইলেন অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী। রক্তহীন ও অস্ত্রহীন সংগ্রাম। এ আবার কেমন সংগ্রাম !

জগৎ অবাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল ভারতের দিকে, লক্ষ্য করিতে লাগিল এই অশ্রুতপূর্ব সংগ্রামের গতি ও পদ্ধতি।

সেনাপতি সৈন্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভারতবর্ষ কেন পরাধীন জান ? আমরা কি কোনদিন সাহস করিয়া ইংরাজকে বলিতে পারিয়াছি,—তোমরা এ-দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও, আমাদের দেশ, আমরাই শাসন করিব। তোমাদের জবর-দখল আমরা মানিব না।"—একথা বলিতে পারি নাই বলিয়াই আমরা পরাধীন, আমরা শোষিত। জাতির প্রাণে যখন পৌরুষ জাগিয়া উঠে, পরাধীনতার ব্যথা তখন মূর্তিমান হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ; তখনই ছিঁড়িয়া যায় পরাধীনতার শৃঙ্খল।

জাতির ইচ্ছা ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন জাতিকে পরাধীন করিয়া রাখা চলে না। আমাদের ইচ্ছায় ও সহযোগিতায়ই ত ইংরাজ আমাদিগকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে।

এতদিন পরে আমাদের শৃঙ্খল ছিঁড়িবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, এইবার বর্জন করিতে হইবে সহযোগিতা। আমাদের এই সংগ্রামের নাম 'অহিংস-অসহযোগ সংগ্রাম'।

ছত্রিশ বৎসর আগের কথা।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের এক শুভ মুহূর্তে গান্ধীজি দীক্ষা দিলেন ভারতবর্ষকে অহিংস-অসহযোগ মন্ত্রে।

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ইংরাজের বিরুদ্ধে চলিতে লাগিল অহিংস-অসহযোগ সংগ্রাম। তরবারি নাই, বন্দুক নাই, কামান নাই, এরোপ্লেন নাই, বোমা নাই, নাই আণবিক বোমা, তবুও সংগ্রাম—মহাসংগ্রাম।

এই সংগ্রামের একটিমাত্র অমোঘ অস্ত্র অসহযোগ, অর্থাৎ শাসনকার্যে ইংরাজকে কোনরূপ সাহায্য না করা।

গান্ধীজি ভারতবাসীকে ডাক দিলেন,—"তোমরা এস, ইংরাজের গোলামখানা ছাড়িয়া বাহিরের মুক্ত বায়ুতে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচো।"

ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান, চাষী-মজুর সকলের কানে পৌঁছাইল সে ডাক। তাহারা দলে দলে গান্ধীজির ছত্র-ছায়াতলে সমবেত হইল।

দেশের অন্তঃপুরেও সে ডাক পৌঁছাইল। কোমলপ্রাণা মহিলারাও সে ডাকে সাড়া না দিয়া পারিলেন না।

ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ ছাড়িলেন, সরকারী কর্মচারীরা অফিস বর্জন করিলেন, কেরাণীরা কলম ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার আদালতে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

কারখানায়, চা-বাগানে ধর্মঘট সুরু হইল।

চাষীরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করিল।

সরকার প্রমাদ গণিল।

এই মহাপ্লাবন প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন শক্তি ইংরেজ সরকারের কোথায়! তবুও চলিল উৎপীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন।

দলে দলে লোক জেলে যাইতে লাগিল, জেল ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত দেশবাসীকে জেলে পুরিবে, তেমন প্রকাণ্ড জেল কোথায় ?

এতদিন পরে ভারতবাসীর ভয় ভাঙিয়াছে। যে ভয় পায়, তাহাকেই ভয় দেখানো চলে। যে কিছুতেই ভয় পায় না—মরণেও না, তাহাকে কিসের ভয় দেখাইবে ?

এতদিন ভারতবাসীর জেলের ভয় ছিল, কিন্তু তাহাদের সে ভয় আর নাই। জেলখানা আজ তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

জেলখানায় ঢুকিয়াই ত তাহারা জেল ভাঙিতে শিখিয়াছে—শাবলের আঘাতে নয়—অন্তরের শক্তিতে। এই শক্তিই ত ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য।

। চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ড ॥

ভারতের সর্বত্র যখন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকভাবে চলিতেছিল, তখন এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে গান্ধীজি সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইলেন।

ঘটনাটি এই—কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী হিংসার আশ্রয় লইয়া চৌরিচৌরা থানায় আগুন ধরাইয়া দিল। ইহার ফলে সরকারী কাগজপত্র সব নষ্ট হইল এবং কয়েকজন পুলিশ কনেষ্টবল আগুনে পুড়িয়া মারা গেল।

এই দুঃসংবাদে গান্ধীজি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়া আন্দোলন বন্ধ রাখিতে আদেশ করিলেন।

গান্ধীজি বলিলেন,—"দেশ এখনও অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। কংগ্রেস-কর্মিগণকে কথায় ও কার্যে সম্পূর্ণরূপে অহিংস হইতে হইবে, তবেই তাঁহারা অহিংস-অসহযোগ সংগ্রামের যোগ্য সৈনিক বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

আত্মশুদ্ধি ও অহিংসা একই কথা। আত্মশুদ্ধি না হইলে অহিংস হওয়া যায় না। দেশ প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া আমি যে গর্ব করিতাম, আমার সে গর্ব আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আমার ব্যক্তিগত ভুলের জন্য কয়েকটি নিরপরাধ লোক নিহত হইল। এই পাপের জন্য আমাকে দীর্ঘদিন প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। দেশ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হইলে আমি আর কখনও এরূপ আগুন লইয়া খেলা করিব না।"

এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য গান্ধীজি পঁচিশ দিন অনশন করিলেন।

গান্ধীজি জাতির পাপের বোঝা নিজে মাথা পাতিয়া বহন করিলেন। কৃচ্ছ্রসাধ্য অনশনের ভিতর দিয়া তিনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্তও করিলেন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিল না।

ক্ষমা মহতের লক্ষণ, বীরের ধর্ম।

যে জাতি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যায় হস্ত কলুষিত করিতে পারে, সে জাতির মহত্ত্ব কিংবা বীরত্ব কোথায়? তাই ইংরাজ সরকার গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে পুরিল। কিন্তু আগুন নিভিল না।

আবার ভারতের বুকে নামিয়া আসিল উৎপীড়নের জগদ্দল পাথর। ইংরাজ-কারাগারে বন্দী গান্ধীজি ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের ন্যায় ইংরাজ-জাতির মঙ্গল কামনা করিলেন; তাহাদের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে গান্ধীজিকে মুক্তি দেওয়া হইল। ভারতের বুকে আবার খুশির বন্যা বহিয়া গেল।

গান্ধীজি বলিলেন,—"আনন্দ কিসের, মুক্তিই বা কিসের? ক্ষুদ্র জেলে, অর্থাৎ 'সেলে' আবদ্ধ ছিলাম, বৃহৎ জেলে আসিয়াছি। ভারতের চতুর্দিকে হিমালয় পর্বতের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে জেলের প্রাচীর। সেই প্রাচীর যে-দিন তোমরা অহিংসার অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ভাঙিতে পারিবে, সেই দিনই আসিবে প্রকৃত আনন্দ ও প্রকৃত মুক্তির দিন।"

এইবার গান্ধীজির নজর পড়িল গঠনমূলক কার্যের দিকে। চৌরিচৌরায় তিনি যে আঘাত পাইলেন, সেই আঘাতই তাঁহাকে

কিছুদিনের জন্য রাজনীতি হইতে খানিকটা দূরে সরাইয়া রাখিল। গান্ধীজি যখন কংগ্রেসে প্রবেশ করিলেন, তখন কংগ্রেসের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের হিসাব-নিকাশ করিয়া গান্ধীজি যে জমা-খরচ তৈরী করলেন, তাহাতে দেখা গেল, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরে কংগ্রেস কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে নাই, কাজেই তাহার জমার ঘরে পড়িয়াছে শূন্য।

গান্ধীজি জাতিকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন,—"তোমরা এতদিনে কংগ্রেসে কেবল কথার জালই বুনিয়াছ, কাজের জাল বোনো নাই। আবেদন-নিবেদনের ফিরিস্তি আর কথার জাল। এইবার কথা-বোনা ছাড়িয়া কাপড় বোনো—চরকা ধর।"

॥ চরকা ও খদ্দর প্রচার ॥

"ভারতের চরকা, ভারতের তাঁত, ভারতের বয়ন-শিল্প এক-দিন জগতের বিস্ময়ের বস্তু ছিল। আজ একখণ্ড কাপড়ের জন্য ভারতকে তাকাইয়া থাকিতে হয় মাঞ্চেস্টারের দিকে। যে জাতি নিজেদের চেষ্টায় মা-ভগিনীদের লজ্জা নিবারণ করিতে পারে না, সে জাতির জগতে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার নাই।

পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের অনেক কথা বলা হইয়াছে। এখন আর কথার প্রয়োজন নাই, আছে কাজের প্রয়োজন। কাজ কর, চরকা ধর, ভারতের ঘরে ঘরে চরকার বাণী প্রচার কর।"

'আপনি আচরি কর্ম পরেরে শিখায়।' গান্ধীজি নিজেও চরকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ঘরে ঘরে চরকা চলিতে লাগিল—ঘর্ ঘর্ ঘর্। 'নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ' স্থাপিত হইল, খদ্দরের কাপড়ে বাজার ছাইয়া গেল। গরীবের মনে শক্তি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আসিল শান্তি।

কংগ্রেসে আইন হইল কংগ্রেস কর্মীদের খদ্দর পরিতে হইবে। সেই খদ্দরের সূতা তাঁহাদের নিজেদের হাতে নিজেদের চরকায় কাটিতে হইবে। কংগ্রেসকর্মীদের দৈনিক কর্মসূচীর মধ্যে চরকায় সূতা-কাটা বাধ্যতামূলক করা হইল।

চরকায় দৈনিক সূতা না-কাটা এবং দৈনিক খদ্দর না-পরার অপরাধে বহু কর্মীকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করা হইল।

খদ্দর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্য, বিশেষ করিয়া,

বিলাতী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিল। বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চলিল। হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব হইল। মাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কলওয়ালারা হাহাকার করিয়া উঠিল।

ইংরাজ সরকার প্রমাদ গণিল। ভারতবাসীর পরমুখাপেক্ষিতা ও কাপুরুষতার সুযোগ লইয়াই ত ভারতের বুকে ইংরাজ-প্রভুত্ব কায়েম হইয়াছিল।

কাজেই ভারতবাসীর স্বাবলম্বন ও ভয়শূন্যতা দেখিয়া ইংরাজ সরকার দস্তুরমত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

গান্ধীজি রাজনীতি হইতে সাময়িকভাবে অবসরগ্রহণ করায় ইংরাজেরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। কিন্তু এ আবার কোন্ বিপদ! এ ত হাতে না মারিয়া ভাতে মারার এক নূতন ফন্দি।

ইংরাজ বেণিয়ার জাত; তাহারা দেহের মাংস কাটিয়া দিতে পারে, কিন্তু মুনাফা ছাড়িতে পারে না।

ইংরাজ-প্রভুরা নিরুপায় হইয়া আবার গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিল। আলোচনার পর আলোচনা, আলোচনার আর শেষ নাই।

এইবার গান্ধীজি 'হরিজন' অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তিনি দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন,—"অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে; অধিকন্তু উহা হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট একটা পচনশীল পদার্থ, একটা ভ্রান্তি ও একটা পাপ। সুতরাং উহার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক হিন্দুরই ধর্ম ও পবিত্র কর্তব্য। উহাকে পাপ মনে করিয়া প্রত্যেক হিন্দুরই প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।"

এই সময়ে গান্ধীজিকে প্রায়ই রাজধানী দিল্লীতে যাইতে হইত। দিল্লীতে যাইয়া তিনি ভাঙীকলোনী, অর্থাৎ মেথর পল্লীতে বাস করিতেন।

গান্ধীজির শুভাগমনে দিল্লীর ভাঙীকলোনী ভারতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। এতদিন পরে মেথরেরা তাহাদের প্রাণের ঠাকুর পতিতপাবন গান্ধীজির সন্ধান পাইল। মেথরদের অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার কুঁড়ে ঘর, সেই কুঁড়ে ঘরে আসিয়া জুটিলেন ভারতের ইংরাজ বড়লাট, বিলাতের বড় বড় মন্ত্রীরা, কত রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদ্শা। দিল্লীর ভাঙী কলোনী বিশ্বের মহাতীর্থে পরিণত হইল। মেথরেরা বুঝিল, বড়লাট-মন্ত্রী, রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদ্শা যেমন মানুষ, তাহারাও তেমনি মানুষ।

তাহারা আরও বুঝিল, গান্ধীজি দেবতা, গান্ধীজি পতিত-পাবন, তাই তিনি পতিত, অস্পৃশ্যও অধমকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদিগকে মানুষের অধিকার দান করিলেন।

সাম্য ও প্রেমের পূজারী গান্ধীজি বলিলে,—"সর্বপ্রকার অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্য ভুলিয়া ভারতের উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সমস্ত জাতিকে বক্ষে বক্ষে মিলিত হইতে হইবে। ক্ষুদ্র বলিয়া, নীচ বলিয়া আর কাহাকেও ঘৃণা করা চলিবে না। আমাদের মধ্যের এই সব বৈষম্য ও বিরোধই ত ভারতের পরাধীনতা ডাকিয়া আনিয়াছে।"

গান্ধীজি অস্পৃশ্যদের নাম দিলেন 'হরিজন'। এই হরিজনদের মুক্তির জন্যই তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য সনাতনীদের হাতে তাঁহাকে বহু দুঃখ-দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই তিনি এই পরম সত্য হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। ভারতের হরিজনেরা গান্ধীজিকে বিধাতার আশীর্বাদরূপেই লাভ করিয়া ধন্য হইল।

গান্ধীজি যখন প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'পল্লী-উন্নয়ন' ও 'হরিজন আন্দোলনে' ডুবিয়া ছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে কংগ্রেস হইতে পুনরায় তাঁহার ডাক আসিল। কংগ্রেসের এই ডাক গান্ধীজি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিয়াই ইংরাজ সরকারের বে-আইনী আইন ভঙ্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

অন্যায় আইন করিয়া ইংরাজ দেশের মানুষের অধিকার হরণ করিয়াছে। সেই অধিকার ফিরাইয়া আনিতে হইলে ইংরাজের আইন ভাঙিতে হইবে।

লবণ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, কিন্তু ইহা তৈরী করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাই গান্ধীজি স্থির করিলেন, সর্বাগ্রে লবণ আইন ভঙ্গ করিতে হইবে।

আইন ভঙ্গের অভিযান চলিল ডাণ্ডীর সমুদ্রোপকূলের দিকে।

সর্বাগ্রে সেনাপতি গান্ধীজি, পশ্চাতে চলিয়াছে তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী।

আইন ভঙ্গ করিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইল। গান্ধীজির জয় হইল, ইংরাজ পরাজয় বরণ করিয়া রহিল।

দীর্ঘ যষ্টির উপর শীর্ণ-দেহভার ন্যস্ত করিয়া বলদর্পী ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চলিয়াছেন অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী। জগতের ইতিহাসে এ দৃশ্যের তুলনা মিলে না।

গান্ধীজি বলিলেন,—"অহিংসার দ্বারা যে শক্তিলাভ করা যায়, তাহা মাংসপেশীর শক্তি নহে, সে শক্তি হৃদয়ের, সে শক্তিদ্বারা বিশ্ব জয় করা যায়।"

এই হৃদয়ের শক্তিতেই শক্তিমান ছিলেন গান্ধীজি।

তাই তিনি একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত জগতের আর কোন শক্তিকে। বিন্দুমাত্রও ভয় করিতেন না।

আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্বোধন করিলেন গান্ধীজি তারপর চতুর্দিকে চলিতে লাগিল আইন-ভঙ্গের হিড়িক।

ভারতের বুক চিরিয়া চতুর্দিক হইতে রব উঠিতে লাগিল,— "অন্যায় আইন মানিব না, অন্যায় খাজনা দিব না, অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিব না।"

ইংরাজ বুঝিল, ভারতের গণদেবতা জাগিয়া উঠিয়াছে, ভারত মহাসাগরের বুকে গগনস্পর্শী ঢেউ উঠিয়াছে, এ শক্তিকে, এ প্লাবনকে রোধ করা যাইবে না। 'তবু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'।

গান্ধীজিকে আবার বন্দী করা হইল। বড় কারাগার ছাড়িয়া গেলেন তিনি ছোট কারাগারে।

কিন্তু সংগ্রাম থামিল না। দিনের পর দিন পুলিশের অত্যাচার আরও বাড়িয়া চলিল। পুলিশের গ্যাস চলিল, লাঠি চলিল, গুলি চলিল; জেলখানা ভরিয়া উঠিল, কিন্তু ভারতের গণদেবতা দমিল না।

ইংরাজ বাধ্য হইল গান্ধীজিকে মুক্তি দিতে। আবার আলোচনা চলিল, আলোচনার পর আলোচনা, আলোচনার আর শেষ নাই।

পশ্চিমের আকাশে তখন মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। যে-কোন মুহূর্তে ঝড় উঠিতে পারে। সত্যই একদিন ঝড় উঠিল।

ইউরোপের বুকে দ্বিতীয় বিশ্বসমরের রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। ইংরাজ-দরবারে আবার গান্ধীজির ডাক পড়িল। আগের বারের মত তাহারা বলিল,—"আমাদের সাহায্য কর। যুদ্ধান্তে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।"

'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়'।

গান্ধীজি বলিলেন,—"তোমাদের আমরা বিশ্বাস করি না। তোমরা কথায় কথায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর, ন্যায়-নীতির মর্যাদা রক্ষা কর না। কাজেই আমরা তোমাদের সাহায্য করিব না।"

ইংরাজ গান্ধীজিকে জানিত। তাঁহার না-কে হাঁ-করা হিমালয় পর্বত লঙ্ঘন করার চেয়েও কঠিন। আলোচনা ফাঁসিয়া গেল।

ইংরাজ চোখে অন্ধকার দেখিল। বিলাতের পার্লামেণ্টে, দিল্লীর বড়লাটের দরবারে সলা পরামর্শ চলিতে লাগিল।

ইংরাজের দরবারে আবার গান্ধীজির ডাক পড়িল। আবার আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল।

ইংরাজের সুর এবার খানিকটা নরম হইল; কিন্তু গান্ধীজি দমিলেন না।

তিনি বলিলেন,—"ভারতবর্ষকে এখনই স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হইবে; তবেই ভারতবাসীরা তোমাদের সাহায্য করিতে পারে, নচেৎ নয়।"

ইংরাজ বুঝিল,—'ভবী ভুলিবার নয়।' কাজেই আলোচনা এবারেও ফাঁসিয়া গেল।

গান্ধীজি ইংরাজের বিরুদ্ধে শেষবারের মত সর্বাত্মক ঘোষণা করিলেন। এই সংগ্রামের ধ্বনি হইল—"ইংরাজ ভারত ছাড়।"

আবার নামিয়া আসিল ভারতের বুকে ইংরাজের অত্যাচার, উৎপীড়নের জগদ্দল পাথর। গান্ধীজি বন্দী হইলেন, জওহরলাল বন্দী হইলেন, বন্দী হইলেন ভারতের সব নেতা।

কিন্তু "ইংরাজ ভারত ছাড়" আন্দোলন দমিল না।

"করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে"—হয় দেশ স্বাধীন করিব, নয় মরিব, —সকলের মুখে এই একই কথা—একই শপথ।

এতদিনে ভারত গতিশীল হইল, চালক নাই, নেতা নাই, তবু সে চলিল, তবু সে প্রস্তুত হইল।

ইংরাজের তূণে যে সব চোখা চোখা তীর ছিল, সবগুলিই ছোঁড়া হইল ভারতের বুকে। তবু সে দুর্বার গতিতে চলিল।

গণদেবতা যখন চলিতে আরম্ভ করে, পৃথিবীর কোন্ শক্তি তাহার গতিরোধ করিতে পারে?

বিপ্লবের আগুন প্রথম জ্বলিয়া উঠিল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাই ইহার নাম দেওয়া হইল 'আগষ্ট বিপ্লব'।

একজন ইংরাজ সাংবাদিক বলেন,—"সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে এত বড় বিদ্রোহ আর কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই।"

আগষ্ট বিপ্লবের আয়ুষ্কাল দুই বৎসর। এই দুই বৎসর ভারতের বুকের উপর দিয়া নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল।

সারা পৃথিবীতে তখন রণ-দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। এমন কি, ভারতের পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মদেশ এবং উত্তর-পূর্ব

সীমান্ত আসামের উপরও তখন জাপানীদের আক্রমণ চলিয়াছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' সংগঠিত হইয়াছে। তিনি ইংরাজ কবলিত ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য জার্মানী ও জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

দেশব্যাপী অশান্তি ও বিক্ষোভ দমন করিতে ইংরাজ সরকার তখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। এই দুর্যোগ ও অশান্তির সমস্ত দায়িত্ব তাহারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপাইয়া দিল।

গান্ধীজি কারাগার হইতে ইংরাজ সরকারের এই অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি ইংরাজ সরকারকে লিখিয়া জানাইলেন,—"তোমরা সত্যের অপলাপ করিতেছ। একমাত্র অহিংসার নীতিতেই আমি বিশ্বাসী।

কংগ্রেস অহিংসার মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছে। কংগ্রেসের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর মূলে কোন অন্যায় বা অসত্য নাই। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পৃথিবীর সভ্য-জাতিসমূহের নিকট প্রচার করিতেছি যে, ভারতব্যাপী এই বিক্ষোভ ও অশান্তির একমাত্র দায়িত্ব তোমাদেরই—কংগ্রেসের নয়।"

এই সময়ে গান্ধীজি জেলে অনশন করিতেছিলেন। ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল।

গান্ধীজির অনশন ও ভগ্নস্বাস্থ্যের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশব্যাপী আবার আর একটা বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গেল।

দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিল গান্ধীজির মুক্তির আন্দোলন।

অতঃপর ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে ইংরাজ সরকার গান্ধীজিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইল। মুক্তিলাভের পর গান্ধীজি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় 'হরিজন-সেবা' ও সমাজ-সেবায়' আত্মনিয়োগ করিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিসভার পতন ঘটিল।

ক্লিমেণ্ট এট্‌লীর নেতৃত্বে শ্রমিক দলের মন্ত্রিসভা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হইল।

এট্‌লী দূরদর্শী রাজনীতিক; তিনি দেখিলেন, যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। যে কোন মুহূর্তে অর্থনৈতিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল ধ্বসিয়া পড়িতে পারে। কাজেই ভারতবর্ষ শাসন করা এখন আর তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইবে না।

সুতরাং তাঁহারা সাদা প্রাণে ও খোলা মনে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের সদিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন দায়িত্বশীল সভ্য ভারতে আসিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পুরোভাগে দাঁড়াইলেন মহাত্মা গান্ধী।

তিনি বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—এই উভয় দলেরই উপদেষ্টারূপে কার্য করিতে লাগিলেন।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে বৃটিশ মন্ত্রিমিশনের সুপারিশ ক্রমে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে এক বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এই শুভসংবাদ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য ইংরাজ সরকার ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের দ্বারা একটি দল গঠন করাইলেন। এই দলের নাম দেওয়া হইল 'মুসলীম লীগ'।

ভারতকে খণ্ডিত করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের জন্য 'পাকিস্তান' নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই এই দলের উদ্দেশ্য।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে এইদল স্বাধীনতা সংগ্রামে পদে-পদে কংগ্রেসকে বাধা দিতে লাগিল।

এই সময়ে ভারত সচিব মিঃ আমেরি বৃটিশ পার্লামেণ্টে এক বিবৃতি দান করেন। এই বিবৃতিতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, বড়লাটের শাসন-পরিষদ কেবলমাত্র ভারতীয়দের দ্বারাই পুনর্গঠিত হইবে এবং পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের সদস্য-সংখ্যা সমান সমান থাকিবে।

কংগ্রেস এই প্রস্তাব মানিয়া লইল, কিন্তু মুসলীম লীগ কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইল না।

এদিকে বৃটিশ মন্ত্রিমিশন মুসলীম লীগের 'পাকিস্তান' প্রস্তাবকে অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলিয়া রায় দিলেও মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিকে মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া প্রকারান্তরে মুসলীম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলনীতিগুলিই মানিয়া লইলেন।

অধিকন্তু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাইয়া লীগপন্থী মুসলমানগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ইহার পরেই আরম্ভ হইল মুসলীম লীগের কুখ্যাত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র হিড়িক।

মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট হইতে কয়েকদিন কলিকাতার রাজপথে যে বর্বর ও নিষ্ঠুর হত্যা ও ধ্বংসলীলা চলিল, জগতের বর্বরতম জাতির ইতিহাসেও তাহার তুলনা নাই।

কলিকাতার এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শুনিয়া গান্ধীজির চোখে জল আসিল।

বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য মানুষ কি করিয়া এত নীচে হিংস্র পশুর স্তরে নামিয়া আসিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারিলেন না।

তিনি জীবনে বহু আঘাত পাইয়াছেন, কিন্তু এবারকার বিষম আঘাতে তাঁহার জীর্ণ-শীর্ণ দেহের সব কয়খানি অস্থি-পঞ্জর ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

অহিংসার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী স্থাপনই তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা। সেই জীবনব্যাপী সাধনা এতদিনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে চলিল, দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত, ব্যথিত ও মর্মাহত হইলেন।

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্র বিষ পূর্ববঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে সংক্রামিত হইতে লাগিল।

গান্ধীজি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একখানি দীর্ঘ যষ্ঠির উপরে শীর্ণ দেহভার ন্যস্ত করিয়া প্রথমে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন কলিকাতার বুকে; তারপর গেলেন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে এবং তারপর বিহারে।

॥ নোয়াখালি ও বিহার-পরিক্রমা ॥

গান্ধীজি নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সেই বৃদ্ধ বয়সে কখনও নৌকায়, কখনও বা পায়ে হাঁটিয়া নোয়াখালির পল্লী-অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুরন্ত শীতকে উপেক্ষা করিয়া যুবকের মনোবল লইয়াই তিনি এই কাজ করিতে অগ্রসর হইলেন।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সফর করিয়া তিনি সংখ্যালঘুদের মন হইতে ভয় দূর করার চেষ্টা করিলেন; অনুরোধ করিলেন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে এই নিষ্ঠুর হত্যার তাণ্ডবলীলা বন্ধ করিতে

তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

গরিষ্ঠ-সম্প্রদায় অনুতপ্ত হইল, সংখ্যালঘুরা আশ্বস্ত ও বিপন্মুক্ত হইল।

নোয়াখালির আরব্ধ কার্য শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহার ডাক আসিল বিহার হইতে।

গান্ধীজির বিহারে উপস্থিতির পরেই সেখানকার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু পাঞ্জাবে জ্বলিয়া উঠিল দাঙ্গার আগুন।

মহাত্মা ছুটিলেন দিল্লীর দিকে। তাঁহার চেষ্টায় পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটিল বটে, কিন্তু আবার কলিকাতায় দাঙ্গা আরম্ভ হইল।

তিনি দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসিয়াই অনশন আরম্ভ করিলেন। দাঙ্গা থামিল; আততায়ীরা সমর্পণ করিল নিজ নিজ অস্ত্র মহাত্মার পায়ের তলায়।

উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করিলেন। স্বাধীনতা দিবসে উভয় সম্প্রদায়ের লোক নির্ভয়ে রাস্তায় যাতায়াত করিয়াছে, বন্ধুভাবে মিলিত হইয়াছে—আলিঙ্গন করিয়াছে একে অন্যকে।

যিনি এই দিনের দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই শ্রদ্ধায় এই 'ফকির' মহামানবের কাছে মাথা নত করিয়াছেন।

এই অলৌকিক শক্তি শুধু গান্ধীজির মধ্যেই নিহিত ছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বের নিকটে আজ পাপ হার মানিয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে গান্ধীজি পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আগত আশ্রয়-প্রার্থীদের অসুবিধা দূর করিতে দিল্লীর দিকে ছুটিলেন।

অতঃপর তিনি পাঞ্জাবী আশ্রয়-প্রার্থীদের নিরাপত্তা স্থাপনের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করিলেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া সৃষ্টি হইল দুই নূতন রাষ্ট্র—'ভারত যুক্তরাষ্ট্র' ও 'পাকিস্তান'।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কূলহারা সমুদ্রের বুকে যে তরী ভাসাইয়াছিলেন, গান্ধীজির বলিষ্ঠ পরিচালনায় এতদিনে সে তরী আসিয়া তীরে ভিড়িল। ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিল।

মহাপ্রয়াণের মহাদুর্দিনে

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজি প্রার্থনা-সভায় যাইতেছিলেন। প্রত্যহ তিনি আভা ও মানু গান্ধীর কাঁধে ভর করিয়া প্রার্থনা-সভায় যাইতেন।

হঠাৎ ভিড় কাটাইয়া এক যুবক গান্ধীজির নিকটে পৌঁছিল।

পদধূলি গ্রহণ করিবার ছল করিয়া সে লুক্কায়িত রিভলভার দ্বারা গান্ধীজির পেট ও বুক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। গুলি তাঁহার দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। মুখে দুইবার মাত্র 'রাম-নাম' উচ্চারণ করিয়া তিনি ধূলিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিরলা-ভবনে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেইখানেই অর্ধঘণ্টা পরে তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল।

মূর্তিমান অহিংসা হিংসার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিলেন।

বৈকালে বেতারবার্তায় সমগ্র জগতে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইল।

ভারতের আকাশ সহসা বিষাদের কালিমায় আবৃত হইল। চল্লিশ কোটি ভারতবাসী শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়িল। জাতি হারাইল তাহার জনককে।

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইল।

পলাশীর কলঙ্ক কালিমার পরে আর এক দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা ভারতের ললাটে অঙ্কিত হইল।

গান্ধীজি জীবনের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া করজোড়ে মৃত্যুর কাছে মাথা নোয়াইলেন; হয় ত মনে মনে তিনি আততায়ীকে ক্ষমা করিয়া গেলেন।

গান্ধীজির তুলনা গান্ধীজি নিজে।

পৃথিবীতে এমন ভাষা নাই, এমন লেখনী নাই, এমন ভাষ্যকার নাই, যাহাদের দ্বারা মহাত্মা গান্ধীর অলৌকিক জীবনী-বেদ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

গান্ধীজির জীবনের ঘটনাপঞ্জী

(১৮৬৯ খ্রীঃ—১৯৪৮ খ্রীঃ)

১৮৬৯ খ্রীঃ—কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম।

১৮৭৬ "—রাজকোটের পাঠশালায় ভর্তি।

১৮৮১ "—কাথিয়াবাড় হাই-স্কুলে প্রবেশ।

১৮৮৩ "—শ্রীমতী কস্তুরবা'র সঙ্গে বিবাহ।

১৮৮৪ "—পিতা কাবা গান্ধীর মৃত্যু।

১৮৮৭ "—প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কলেজে প্রবেশ।

১৮৮৮ "—বিলাত যাত্রা।

১৮৮৯ "—বিলাতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯১ "—ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও স্বদেশ-যাত্রা।

১৮৯৩ "—দক্ষিণ-আফ্রিকা-যাত্রা।

১৮৯৪ "—নাটাল কোর্টে ওকালতি আরম্ভ। 'নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' ও 'নাটাল শিক্ষা-সমিতি' প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৬ "—ভারতে আগমন ও দক্ষিণ আফ্রিকা-সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন।

১৮৯৭ "—সপরিবারে ডারবানে অবতরণ।

১৮৯৯ "—বুয়র যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী গঠন।

১৯০১ "—ভারতে প্রত্যাবর্তন ও কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকের কার্যগ্রহণ।

১৯০২ "—ব্রহ্মদেশ-যাত্রা।

১৯০৩ খ্রীঃ—ট্রান্সভালে এটর্ণির ব্যবসায় আরম্ভ ও 'ফিনিক্স আশ্রম' প্রতিষ্ঠা।

১৯০৪ "—বিভিন্ন ভাষায় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রকাশ।

১৯০৬ "—ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ।

১৯০৭ "—'প্রতিরোধ-সত্যাগ্রহ' আরম্ভ, ভারতীয়দের দলে দলে কারাবরণ।

১৯০৮ "—জোহান্সবার্গে দুইবারে দুইমাস করিয়া চারিমাস কারাদণ্ড।

১৯১০ "—বিলাতে অবস্থান ও 'হিন্দ্-স্বরাজ' নামক পুস্তক প্রণয়ন।

১৯১০ "—'টলষ্টয় ফার্মের' প্রতিষ্ঠা এবং মুচির কার্যে শিক্ষানবিশী।

১৯১২ "—'টলষ্টয় ফার্মে' মহামতি গোখেলের সহিত অবস্থান।

১৯১৩ "—হিন্দু-বিবাহ-আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ। কস্তুরবা'র কারাদণ্ড। ট্রান্সভালের পথে চারিদিনের মধ্যে তিনবার গ্রেপ্তার এবং তিন মাস ও নয় মাস কারাদণ্ড।

১৯১৪ "—আশ্রমবাসীদের নৈতিক অধোগতির জন্য পনের দিন উপবাস। কস্তুরবা'কে সঙ্গে লইয়া বিলাত-যাত্রা।

১৯১৫ "—'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক-প্রাপ্তি ও শান্তিনিকেতনে কবিগুরু কর্তৃক 'মহাত্মা' আখ্যা লাভ।

১৯১৬ "—কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসবে এবং লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান।

১৯১৭ "—চম্পারণ-সত্যাগ্রহ। সবরমতী-তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা। 'সোস্যাল সার্ভিস লীগে' সভাপতিত্ব।

১৯১৮ খ্রীঃ—আমেদাবাদের মজদুরদের লইয়া সত্যাগ্রহ। খেড়া সত্যাগ্রহ। মুস্‌লীম লীগের সভায় যোগদান। যুদ্ধে সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা।

১৯১৯ ”—দেহে অস্ত্রোপচার। ‘রাউলাট্ আইনের’ প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা। গ্রেপ্তার। তিনদিন অনশন। ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ ও ‘নবজীবন’ পত্রিকার সম্পাদনা। ‘নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে’ সভাপতিত্ব।

১৯২০ ”- জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ‘কাইজার-ই-হিন্দ মেডেল’ ও ‘বুয়র যুদ্ধের মেডেল’ প্রত্যর্পণ। দৈনিক সূতা-কাটার ব্রত-গ্রহণ।

১৯২১ ”—‘তিলক স্বরাজ্য তহবিলে’ এক কোটি পনের লক্ষ টাকা সংগ্রহ। বোম্বাইয়ে ‘খাদি ভাণ্ডারের’ উদ্বোধন। কলিকাতায় ‘ন্যাশনাল কলেজ’ স্থাপন। ভারতের সর্বত্র বিশ লক্ষ চরকার প্রবর্তন। বোম্বাইয়ে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রায়শ্চিত্তের জন্য পাঁচদিন অনশন। অসহযোগ আন্দোলন। বিশ হাজার কংগ্রেসকর্মীর কারাবরণ। কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক মনোনীত।

১৯২২ ”—চৌরীচৌরার দুর্ঘটনা। পঁচিশ দিন অনশন। গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড। জেলে আত্মজীবনী প্রণয়ন।

১৯২৪ ”—‘য়্যাপেণ্ডিসাইটিসে’ অস্ত্রোপচার। কারামুক্তি। একুশ দিন যাবৎ অনশন। কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯২৫ „—সারা ভারত ভ্রমণ। ভাইকম সত্যাগ্রহ। দেশ-বন্ধুর মৃত্যুর পর দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ও ‘চিত্তরঞ্জন

সেবাসদন' প্রতিষ্ঠা। 'নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের' উদ্বোধন। আশ্রমবাসীদের নৈতিক অধোগতির জন্য সাত দিন অনশন।

১৯২৬ খ্রীঃ—স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর মৃত্যুতে কংগ্রেসে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন।

১৯২৭ "—সিংহল-ভ্রমণ ও খদ্দর প্রচারে অর্থ-সংগ্রহ।

১৯২৮ "—সাইমন কমিশন বর্জন। সর্দারজীর নেতৃত্বে বার্দোলী সত্যাগ্রহ। কংগ্রেসে এক বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতার প্রস্তাব আনয়নের সিদ্ধান্ত।

১৯২৯ "—ইউরোপ-যাত্রার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। কলিকাতায় বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। এক টাকা জরিমানা। কংগ্রেসে পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯৩০ "—'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' এগার দফা সর্ত প্রকাশ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'ডাণ্ডী-অভিযান'। লবণ আইন অমান্য। করাচীতে গ্রেপ্তার। চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল।

১৯৩১ "—২৫শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ। গান্ধী-আরউইন চুক্তি। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত-যাত্রা। লণ্ডনে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী কর্তৃক সম্বর্ধনা। ৫ই ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ।

১৯৩২ "—৪ঠা জানুয়ারী পুনরায় গ্রেপ্তার। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে সাতদিন অনশন। অস্পৃশ্য-দিগকে 'হরিজন' আখ্যা দান।

১৯৩৩ „——'হরিজন সেবক সংঘের' প্রতিষ্ঠা। 'হরিজন পত্রিকা' প্রকাশ। আত্মশুদ্ধির জন্য দুই সপ্তাহ অনশন। চৌত্রিশ জন আশ্রমিকসহ গ্রেপ্তার ও

মুক্তিলাভ। আইন-অমান্যের জন্য পুনর্বার গ্রেপ্তার ও এক বৎসর কারাদণ্ড। পাঁচ দিন অনশন। ২৩শে আগষ্ট মুক্তিলাভ। 'হরিজন আন্দোলনের' জন্য ভারত-পরিভ্রমণ। আট লক্ষ টাকা সংগ্রহ।

১৯৩৪ খ্রীঃ—বিহার ভূমিকম্পে বিহার-পরিক্রমা। পুণায় গান্ধীজিকে লক্ষ্য করিয়া বোমা-বর্ষণ। প্রায়শ্চিত্তের জন্য সাতদিন অনশন। 'গ্রামোদ্যোগ সংঘের' প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যপদ ত্যাগ।

১৯৩৫ "—২৩শে মার্চ হইতে চা'র সপ্তাহ মৌনাবলম্বন। বিহারে 'হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে' সভাপতিত্ব। সেবাগ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ "—জাপানী কবি নোগুচি ও তমিকার সহিত সেবাগ্রামে সাক্ষাৎকার। মার্গারেট সিঙ্গার ও নিগ্রো প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা। দশ সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থতা। 'গান্ধী সেবা-সংঘের অধিবেশন' ও 'নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৭ "—কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন। মাদক নিবারণ। কৃষি-ঋণ লাঘব এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও কারাগার ব্যবস্থার সংশোধন। কবিগুরুর সহিত সাক্ষাৎ-কার। ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশা-ধিকার প্রতিষ্ঠা। 'ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ', 'গান্ধী সেবাসংঘ' ও 'ওয়ার্ধা শিক্ষা সম্মেলনে' সভাপতিত্ব। 'নয়া তালিমীর' পরিকল্পনা। অসুস্থতার জন্য জুহুতে অবস্থান।

১৯৩৮ খ্রীঃ—সেবাগ্রামে প্রত্যাবর্তন। লর্ড লোথিয়ান ও তাকাওকার সহিত সাক্ষাৎকার। পেশোয়ার ভ্রমণ। 'গান্ধী সেবাসংঘে' সভাপতিত্ব। চেক ও জার্মান-য়িহুদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন। মিউনিক চুক্তির সমালোচনা। রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য কলিকাতায় আগমন। বাঙ্গলার লাট সাহেবের সহিত আলোচনা।

১৯৩৯ "—ডাঃ কাগাওয়ার সহিত আলোচনা। ঠাকুর সাহেবের চুক্তিভঙ্গের জন্য রাজকোটে পাঁচদিন অনশন। সুভাষচন্দ্রের সহিত মতানৈক্য। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগের নির্দেশ। বড়লাটের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। মালিকান্দায় 'গান্ধী সেবাসংঘের' অধিবেশনে যোগদান।

১৯৪০ "—শান্তিনিকেতনে আগমন। কবিগুরু কর্তৃক সম্বর্ধনা ও দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের সহিত সাক্ষাৎকার। বড়লাটের সহিত সিমলায় আলোচনা। কংগ্রেস কমিটিসমূহকে সত্যাগ্রহ আশ্রমে রূপান্তরিত। বিনোবা ভাবের দ্বারা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ পরিচালনা। পণ্ডিত জওহরলাল ও মৌলানা আজাদের কারাদণ্ড। 'হরিজন সেবক' ও 'হরিজন বন্ধুর' প্রকাশ বন্ধ।

১৯৪১ খৃঃ—কবিগুরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সর্দারজীর আশ্রমে অবস্থান। পঁচিশ হাজার সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড ও ৬ লক্ষ টাকা জরিমানা। কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ।

১৯৪২ "—'এণ্ড্রুজের স্মৃতি-তহবিলে' পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ। লুই ফিসারের সহিত সাতদিন অবস্থান। 'চিয়াং

দম্পতি, লুই জনসন ও ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত আলোচনা। 'হরিজনের' পুনঃ-প্রকাশ। ৮ই আগষ্ট 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ ও গ্রেপ্তার। মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যু। ভারতব্যাপী আন্দোলন। অধ্যাপক ভাসানীর অনশন।

১৯৪৩ "—দমনীতির বিরুদ্ধে একুশ দিন অনশন।

১৯৪৪ "—২২শে ফেব্রুয়ারী কস্তুরবা'র মৃত্যু। ৬ই মে বিনা-সর্তে মুক্তিলাভ। পঁচিশ দিনের জন্য মৌনাবলম্বন। জীবনে প্রথম সবাকচিত্র দর্শন। মঃ জিন্নাহ্‌র সহিত আলোচনা। বোম্বাইয়ের ডক বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল দর্শন। সেবাগ্রামে 'রবীন্দ্র মৃত্যু বার্ষিকী' ও 'গান্ধী জন্মতিথি' পালন। 'কস্তুরবা-স্মৃতি-ভাণ্ডারে' ১১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ।

১৯৪৫ খৃঃ—মঃ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে আলোচনা। কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তিলাভ। সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা।

১৯৪৬ "—মন্ত্রিমিশনের ভারতআগমন। 'গণ-পরিষদ' ও 'অন্তর্বর্তী সরকার' গঠন। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

১৯৪৭"—নোয়াখালির পল্লী-পরিক্রমা। কাশ্মীর পরিদর্শন। এক দিনের জন্য অনশন। কলিকাতায় তিন দিন অনশন। স্বাধীন ভারতের সূচনা। লীগওয়ালাদের অত্যাচার। কাশ্মীর আক্রমণ। দিল্লীর 'এশিয়া সম্মেলনে' বক্তৃতা। অখণ্ড-বিশ্বগঠনের জন্য আবেদন।

১৯৪৮ "—দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা। পাঁচদিন অনশন। বোমা বিস্ফোরণ। ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম গড্‌সে নামক আততায়ীর গুলিতে নিহত। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিতাভস্ম বিসর্জন। ভারতের বাহিরে বহু স্থানে চিতাভস্ম প্রেরণ।